Khabor Dot Kom

বাংলাদেশের আঞ্চলিক ইতিহাস-ঐতিহ্যে লোকসংস্কৃতির প্রভাব

* সিকদার আবুল বাশার

❖ ❖

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনন্য প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশন এ দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি ও লোকঐতিহ্যের মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ-সংরক্ষণ গবেষণা ও প্রদর্শনের সুব্যবস্থা করে জাতির জন্য যে গুরুদায়িত্ব পালন করছে তা নিঃসন্দেহে গভীর প্রশংসারযোগ্য। এগুলো পরবর্তীকালে বাংলার ইতিহাসের অমূল্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে তাতে সন্দেহ নেই। এই প্রতিষ্ঠান এদেশের জাতীয় লোকসংস্কৃতি ও লোকঐতিহ্য সংরক্ষণে ও গবেষণায় যে গুরুদায়িত্ব পালন করছে এবং এর সাথে যাঁরা মনেপ্রাণে কাজ করে যাচ্ছে তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদজ্ঞাপন করি। আমাকে 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ইতিহাস-ঐতিহ্যে লোকসংস্কৃতির প্রভাব' সম্পর্কিত প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ দান করায় এদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধা, স্বনামধন্য কবি ও এই ফাউন্ডেশনের পরিচালক কবি রবীন্দ্র গোপকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদজ্ঞাপন করছি।

জনসাধারণ ঐতিহ্যগতভাবে যা কিছু অর্জন করে তাকে যেমন ফোকলোর (Folklore) বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, অন্যদিকে লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার, লোকনৃত্য, লোকশিল্প প্রভৃতি বিষয়কেও ফোকলোরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। Folklore বা লোকসংস্কৃতির বিস্তার মূলত লোকজীবনকে কেন্দ্র করে। লোকজীবন বলতে যে অক্ষরজ্ঞানহীন কিংবা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন গ্রামীণ সাধারণ মানুষের জীবনকে বোঝানো হয় এ সংজ্ঞার আপাত পরিবর্তন ঘটেছে। মার্কিন লোককলাবিদ অ্যালান ডানডিসের মতে, বিশ্বের সকল স্তরের মানুষই 'লোক', কেননা, তাদের মধ্যে কোনো না কোনো কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস বিদ্যমান। অর্থাৎ লৌকিক ধ্যান-ধারণাসম্পন্ন ব্যক্তিই 'লোক' বলে গণ্য, সে গ্রামের অক্ষরজ্ঞানহীন বা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন কিংবা শহরের শিক্ষিত ব্যক্তিই হোক না কেন। বাংলার লোকসংস্কৃতি সর্বতোভাবেই বাংলার সে গ্রামেরই হোক কিংবা নগরের। কেননা বর্তমান আধুনিক বাংলার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষেরই শিকড় প্রোথিত রয়েছে গ্রামে। শহর কিংবা গ্রামের সকল শ্রেণির শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের মনেই লালিত হয়ে আসছে এ দেশীয় সংস্কার, সংস্কৃতি ধর্ম-গোত্র-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে।

একটি দেশ ও তার জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয় সে দেশে আঞ্চলিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের গভীরতম বিশে- ষণের মাধ্যমে। যে জাতি তার অতীত ইতিহাস পূর্ণাঙ্গভাবে নির্মাণ করতে পেরেছে, দেখা গেছে সে জাতি তার আঞ্চলিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য ততটাই সংরক্ষণ করে এসেছে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে, লোকসংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে। কারণ সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদানগুলো নিহিত থাকে অতীত ও বর্তমানে চর্চিত লোকসংস্কৃতি ও লোকঐতিহ্যের মধ্যে। আর বাংলাদেশের ইতিহাস এ দেশের রাজা-বাদশা, রাষ্ট্র ও নগর জীবনের ইতিহাসসহ শতকরা ৯০ ভাগ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাপিত জীবনের ইতিহাস। তাই বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকঐতিহ্য দ্বারা আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্মাণ করা যায়।

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি বর্তমানে প্রশাসনিক পূনর্বিন্যাসের কারণে ৬৪টি জেলায় বিভক্ত। ৬৪টি জেলার মাটি ও মানুষের ইতিহাস নিয়েই রচিত হতে পারে বা হওয়া উচিত বাংলাদেশের ও বাঙালির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। বাঙালির আঞ্চলিক ইতিহাস মানেই বাঙালির, বাংলার মাটি ও মানুষের লোকসংস্কৃতির ইতিহাস। লোকসংস্কৃতির প্রভাব তাই শুধু আঞ্চলিক ইতিহাসকেই প্রভাবিত করে না; এর প্রভাব সুদূর প্রসারি। গোটা জাতির ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক ও এমনকি রাজনৈতিক

Khabor Dot Kom

ইতিহাসকেও অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করে। কিভাবে লোকসংস্কৃতি গোটা বাংলাদেশের এবং এর আঞ্চলিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করতে পারে এই প্রবন্ধ সেই বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করবে।

বাংলাদেশের আঞ্চলিকতা আলোচনার প্রারম্ভে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন। 'ইতি + হ + অস = ইতিহাস, অর্থাৎ 'ইতি' অর্থ 'এই প্রকার', 'হ' অর্থ 'সমাচার' ও 'অস' অর্থ 'হওয়া' ইতিহাসের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'এই প্রকার সমাচার হওয়া'। দেশ বা জনজীবনের পুরাবৃত্তের এই 'প্রকার সমাচার হওয়া' বোঝাতে ইতিহাস শব্দের সূত্রপাত। অন্যদিকে 'ইতি' শব্দের সঙ্গে 'য' প্রত্যয়যোগে, 'ঐতিহ্য' শব্দের গঠন। ইতিহাস ও ঐতিহ্য অভিন্ন বিষয় নয়, বরং উভয়ের মধ্যে নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। একটি পরিবারের যেমন রয়েছে ঐতিহ্য তেমনি একটি দেশ বা জাতিরও রয়েছে ঐতিহ্য। বাঙালি শোণিতধারায় একটি শঙ্কর জাতি। আর্য সেমেটিক, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, নিগ্রোবটু প্রভৃতি শোণিতধারার মানুষ এক এক সময় এদেশে এসে বসতি গেড়েছে। মূলত সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শাসকশ্রেণির সংস্কৃতি বাংলাদেশের ভাষা তথা সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে নিজ নিজ সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। উপরোক্ত শোণিতধারার মানুষের পারস্পরিক মিলন ও মিশ্রণ এমনভাবে ঘটেছে যে, এ দেশের কিছু আদিবাসী জনগোষ্ঠী ছাড়া আর তেমন বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। বাংলার বিশাল জনসমুদ্রের একটাই পরিচয় বাঙালি জাতি। বাংলার লোকসংস্কৃতি পুঁথিবদ্ধকরণে বিশেষজ্ঞদের অভিমত, 'ঐতিহ্যের অভ্যন্তরে পরিবর্তনের বীজ নিহিত আছে। অন্যের উপাদান আত্মসাৎ করে ঐতিহ্য সমৃদ্ধি হয়; নানা সৃজনকর্ম ও আচরণমালার মধ্যে ঐতিহ্য বেঁচে থাকে; আবার ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয় প্রক্রিয়ায় নতুন ঐতিহ্য তৈরি হয়। অতএব ঐতিহ্যের তিনটি ধারা আছে (১) প্রাচীন ধারা, যা রক্ষণশীল; (২) সমন্বিত ধারা, যা রূপান্তরধর্মী এবং (৩) নব্যধারা, যা চলমান জীবনে নতুনভাবে সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ঐতিহ্য অতীত থেকে বর্তমানে এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। একটি মানবগোষ্ঠীর ঐতিহ্যের মধ্যে তার যুগসঞ্চিত লৌকিক-পারলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, ভালো-মন্দের চেতনা, ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক প্রভাব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থা সক্রিয় থাকে বলে সে মানবগোষ্ঠীর প্রকৃত আত্মপরিচয় ও জাতিসত্তা এই আবহমান ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত থাকে।

বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস নিয়ে সর্বপ্রথম কাজ শুরু করেন ইংরেজরা, ইংরেজি ভাষায়। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস সাধনার পথে সর্বপ্রথম শিক্ষিত বাঙালির মনে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অতঃপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই দুই বাঙালি বাংলার যে ইতিহাস নির্মাণের পথ দেখিয়েছিলেন তাতে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের উপাদান ব্যাবহারের মাধ্যমেই বাঙালির ও বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হওয়া সম্ভব সে ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

আঞ্চলিক ইতিহাস

আরনল্ড জে. টয়েনবি আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলেছেন 'সমগ্র দেশকে জানতে হলে ক্ষুদ্রতর বিভাগ বা একককে বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন।' বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দের অর্থ হলো নির্দিষ্ট সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত কোনো বিশেষ স্থান এবং সাধারণ বোধগম্য ভাষায় একটি বৃহৎ জনপদের একাংশ বা একক। আঞ্চলিক ইতিহাস হচ্ছে নির্দিষ্ট অঞ্চল বা একটি সীমাবদ্ধ জনজীবনের ইতিহাস, যেখানে আঞ্চলিক লোকায়ত ধারা বা লোকজীবনের অনুপুঙ্খ পর্যালোচনাই হবে প্রধান আলোচ্য।

ইতিহাসের যুক্তিতে যে কোনো ভৌগোলিক পরিবেশকে অঞ্চলরূপে চিহ্নিত করা যায়। আধুনিককালে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে Macro studies ও Micro studies সংজ্ঞা প্রবর্তিত হয়েছে। রাজ্য বা প্রদেশ, রাজ্যের অন্তর্গত বিভাগ, জেলা বা ক্ষুদ্রতর জনপদ কিংবা ভৌগোলিক বিভাগ Micro studies-এর আওতাভুক্ত।

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে, একদিকে সমগ্র বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন দিক, অপরদিকে বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ ও স্থানীয় পারিবারিক বা বংশাবলির ইতিহাস এ দুটি ধারা হাত ধরাধরি করে পরস্পর অগ্রসর হতে শুরু করে। আগেই বলা হয়েছে, বাংলার ইতিহাস প্রণয়ণে ইংরেজদের অবদান অনস্বীকার্য। ইংরেজ প্রণীত ইংরেজি ভাষায় বাংলার ইতিহাসের ওপর

ভিত্তি করেই বঙ্গদেশের অর্থাৎ বাংলাভাষী ইতিহাসবেত্তারা বাংলায় ইতিহাস প্রণয়নে সচেষ্ট হন। তবে বাংলায় সমগ্র বাংলার ইতিহাসই হোক বা আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে, যারা স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা পালন করেন তার সমস্তই ব্যক্তিক উদ্যোগে এবং তাদের সিংহভাগই অপেশাদার। দেশের টানে, দেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবেসে এবং দেশমাতৃকাকে গভীরভাবে জানার কৌতূহলেই তারা এমন কাজে নিবিষ্ট হয়েছিলেন। আঞ্চলিক ইতিহাস সৃষ্টিতে এই অপেশাদার গ্রন্থকারগণকে যে কত-শত প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। শুধু জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা, মমত্ববোধ ও দেশের ইতিহাসকে জনসমক্ষে তুলে ধরার মহান প্রয়াসে ব্রত হয়ে, কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা অর্থ প্রাপ্তির চিন্তা বিবেচ্য না করে এ চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে পূর্বেও যেমন রাষ্ট্রীয় বা সমতুল্য কোনো পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যায়নি, বর্তমান সময়েও বৃহত্তর উদ্যোগ তথৈবচ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদিও-বা কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলা তথা আঞ্চলিক ইতিহাস প্রণয়নে ভূমিকা রাখছে, তবে তা নগণ্যই। পাশ্চাত্যের দেশগুলোর দিকে তাকালে এর যথার্থ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সমাজব্যবস্থা ও শাসনপদ্ধতি তুলনামূলকভাবে অনেক উন্নত। তাদের ইতিহাস রচনার অভিজ্ঞতা, উপাদান সংগ্রহের পদ্ধতি, মহাফেজখানা ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের ব্যবস্থা আমাদের দেশের চেয়ে উন্নত বহুগুণে। এদিক থেকে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার দিকে নজর দিলে দেখা যাবে, এ দেশে নথিপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত; আর সংরক্ষিত নথিপত্র ব্যবহারের চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই সহজসাধ্য নয়। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চাকে গবেষণার পর্যায়ে উন্নীত করতে এবং যথাযথ মর্যাদা দান করতে হলে যেমন এগিয়ে আসতে হবে পেশাদার ঐতিহাসিকদের, তদ্রূপ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি সংশ্লিষ্ট বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা। তবে এসব পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার প্রত্যাশী না হয়ে কিছু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে এ প্রয়াসে সচেষ্ট হয়েছে। অব্যাহত আছে তাদের এই মহান ব্রতী। সমগ্র দেশে তথা আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার পরিচয় করিয়ে দিতে যেসব প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে তার মধ্যে 'বাংলা একাডেমী' ও 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র কথা বাদ দিলে যা দাঁড়াবে তার অন্যতম হলো 'গতিধারা'। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি নিরলস কাজ করে চলেছে। এক্ষেত্রে প্রায় সফল তাদের উদ্দম। অধিকাংশ জেলার ইতিহাস উপস্থাপন ও প্রণয়নের যে সফলতা তা ঈর্ষা জাগানিয়া। গতিধারা'র উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক ইতিহাস-ঐতিহ্যিক প্রকাশনাসমূহ হলো:

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ) – অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি – প্রথম গতিধারা ২০০৬/প্রথম প্রকাশ : ১৯১০ খ্রি.
শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত– (উত্তরাংশ) অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি – প্রথম গতিধারা ২০০৬/প্রথম প্রকাশ : ১৯১৭ খ্রি.
যশোহর খুলনার ইতিহাস (১ম খণ্ড)– সতীশচন্দ্র মিত্র – প্রথম গতিধারা ২০০৬/প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪ খ্রি.
যশোহর খুলনার ইতিহাস (২য় খণ্ড) – সতীশচন্দ্র মিত্র – প্রথম গতিধারা ২০০৬/প্রথম প্রকাশ : ১৯২২ খ্রি.
চট্টগ্রামের ইতিহাস – চৌধুরী শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেববর্ম্মা তত্ত্বনিধি - প্রথম গতিধারা ২০০৪/প্রথম প্রকাশ : ১২৮২ মগী
রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং রাজশাহী পরিচিতি – শ্রীকালীনাথ চৌধুরী সম্পাদনা : ড. তসিকুল ইসলাম – প্রথম গতিধারা ২০০৭/প্রথম প্রকাশ : ১৯০১ খ্রি.
বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) – রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় – প্রথম গতিধারা ২০১০/প্রথম প্রকাশ : ১৩২৪ বঙ্গাব্দ
বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) – রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় – প্রথম গতিধারা ২০১০/প্রথম প্রকাশ : ১৩২৪ বঙ্গাব্দ
বৃহৎ বঙ্গ (প্রথম খণ্ড) – দীনেশচন্দ্র সেন – প্রথম গতিধারা ২০১০/প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৫ বঙ্গাব্দ
বৃহৎ বঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড) – দীনেশচন্দ্র সেন – প্রথম গতিধারা ২০১০/প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৫ বঙ্গাব্দ
ঢাকার বিবরণ ও ঢাকা সহচর – শ্রীকেদারনাথ মজুমদার – প্রথম গতিধারা ২০০৮/প্রথম প্রকাশ : ১৯১০ খ্রি.
ঢাকার ইতিহাস – যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত – প্রথম গতিধারা ২০০৭/প্রথম প্রকাশ : ১৩১৯ বঙ্গাব্দ
বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস – (বৃহত্তর বরিশাল বিভাগ) প্রথম গতিধারা ২০১০/প্রথম প্রকাশ : ১৯১৫ খ্রি.
বিক্রমপুরের ইতিহাস – অম্বিকাচরণ ঘোষ ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত – প্রথম গতিধারা ২০১০/প্রথম প্রকাশ : ১২৭৫ বঙ্গাব্দ
নোয়াখালীর ইতিহাস – শ্রীপ্যারীমোহন সেন – প্রথম গতিধারা ২০০৭/প্রথম প্রকাশ : ১৮৭৬ খ্রি.
ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ – শ্রীকেদারনাথ মজুমদার – প্রথম গতিধারা ২০০৫/প্রথম প্রকাশ : ১২৭৭ বঙ্গাব্দ

http://www.khabor.com/ ..... We Know Bangladesh Better.
Email: info@khabor.com, news@khabor.com

পাবনা জেলার ইতিহাস – রাধারমন সাহা – প্রথম গতিধারা ২০০৬/প্রথম প্রকাশ : ১৯২৩-২৭ খ্রি.
বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস (রাজশাহী বিভাগ : ইতিহাস-ঐতিহ্য) – সম্পাদনায় : বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাসগ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি – প্রথম গতিধারা ২০০৯/প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮ খ্রি.
শ্রীকমলাকান্ড়গুপ্ত চৌধুরীর শ্রীহট্টের প্রাচীন ইতিহাস – ২০০৯
রাজসাহীর ইতিহাস – কাজী মোহাম্মদ মিছের – প্রথম গতিধারা ২০০৭/প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৩ খ্রি.
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মধ্যযুগ – সৈয়দ আলী আহসান – ২০০৩
ঢাকার ইতিবৃত্ত ও ঐতিহ্য – মোহাম্মদ আবদুল কাইউম – ২০০৮
বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস – ড. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল – ২০০২
বাংলার লোকসাহিত্য : সমাজ ও সংস্কৃতি – মাহবুবুল হক – ২০১০
দিনাজপুরের ইতিহাস – ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান – ২০১০
দি ডিস্ট্রিক্ট অব বাকেরগঞ্জ – এইচ. বেভারেজ বি.সি.এস. অনুবাদ : সিকদার আবুল বাশার – প্রথম গতিধারা ২০০৮/প্রথম প্রকাশ : ১৮৭৬ খ্রি.
বগুড়ার ইতিকাহিনী – কাজী মোহাম্মদ মিছের – প্রথম গতিধারা ২০০৭/প্রথম প্রকাশ : ১৯৭ খ্রি.
ফরিদপুরের ইতিহাস – আনন্দনাথ রায় – প্রথম গতিধারা ২০০/প্রথম প্রকাশ : ১৯০৮-১৯২২ খ্রি.
রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস – শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত – প্রথম গতিধারা ২০০৯/প্রথম প্রকাশ : ১৩০৩ বঙ্গাব্দ
বন্দর শহর চট্টগ্রাম [একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা] – আবদুল হক চৌধুরী – প্রথম গতিধারা ২০০৯/প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ খ্রি.
পটুয়াখালী জেলান ইতিহাস – সিকদার আবুল বাশার – ২০১১
অবিভক্ত নদীয়া জেলা ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি (১৭৮৬–১৯৪৭ খ্রি.) – ড. মোহা. জাহাঙ্গীর হোসেন ২০০৯
কিশোরগঞ্জের লোকজপ্রথা ও লোকভাষা – মো. রফিকুল হক আখন্দ – ২০০৯
চট্টগ্রামী ভাষার অভিধান ও লোকাচার – আহমেদ আমিন চৌধুরী – ২০০৯
বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি – মুহম্মদ আবদুস সাত্তার – ২০০৪
বৃহত্তর বরিশালের লোকসংস্কৃতি – সাইফুল আহসান বুলবুল – ২০১০
দিনাজপুর অঞ্চলের লোকসঙ্গীত – সুরাইয়া বেগম – ২০১০
বাংলাদেশের জেলা নামকরণের ইতিহাস – বিলু কবীর – ২০১০
মৌলভীবাজার জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য – রব্বানী চৌধুরী – ২০০৯
শাহজালালের দেশে – রব্বানী চৌধুরী – ২০১০
সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত – মোহাম্মদ মুমিনুল হক – ২০০৬
বাংলায় নীল চাষ ও নীলবিদ্রোহের ইতিহাস – রাজিব আহমেদ – ২০০৮
নীলবিদ্রোহের অজানা ইতিহাস – মহসিন হোসাইন – ২০০৮
কুমিল-ার ইতিহাস – আবুল কাসেম – ২০০৮
লোকসাহিত্যে টাঙ্গাইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য – মামুন তরফদার – ২০০৯
বরিশালের ইতিবৃত্ত – সাইফুল আহসান বুলবুল – ২০০৯
মাদারীপুর জেলার ইতিহাস – সিরাজ উদ্দীন আহমেদ – ২০০৬
মৌলভীবাজার জেলার ইতিহাস – মোহাম্মদ মুমিনুল হক – ২০১০
মেহেরপুর জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য – তোজাম্মেল আযম – ২০০৯
নড়াইল জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য – মহসিন হোসাইন – ২০০৭
নেত্রকোণা জেলার ইতিহাস – আলী আহাম্মদ খান আইয়োব – ২০০৭
নাটোরের ইতিহাস – সমর পাল – ২০০৭
নবাবগঞ্জ পরিচিতি – আবুল কালাম শেখ নূর মোহাম্মদ – ২০০৭
নওগাঁ মহকুমার ইতিহাস – খানসাহেব মোহাম্মদ আফজল – ২০০৭

Khabor Dot Kom

চুয়াডাঙ্গা জেলার ইতিহাস – রাজিব আহমেদ – ২০০৮
ঝালকাঠি জেলার ইতিহাস – সিকদার আবুল বাশার – ২০১০
দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার – ড. মাসুদুল হক – ২০০৮
লক্ষ্মীপুর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য – নাজিম উদ্দীন মাহমুদ – ২০০৮
গোপালগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি – রবীন্দ্রনাথ অধিকারী – ২০০৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য – ড. মাযহারুল ইসলাম তরু – ২০০৯
পঞ্চগড় : ইতিহাস ও লোকঐতিহ্য – ড. নাজমুল হক – ২০০৯
রাজনগরের ইতিবৃত্ত – মোহাম্মদ মুমিনুল হক – ২০০৭
রামুর ইতিহাস – আবুল কাসেম – ২০০৭
অষ্টগ্রামের ইতিহাস ঐতিহ্য – আবুল কাসেম – ২০০৭
দামুড়হুদা উপজেলার ইতিহাস – রাজিব আহমেদ – ২০১১
পুলুম আমার গ্রাম আমার আনন্দ-বেদনা – খোন্দকার ইনামুল কবীর – ২০০৮

আঞ্চলিক ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ধারা হলো পারিবারিক ইতিহাস। বঙ্গদেশে অর্থাৎ বাংলাদেশের অনেক খ্যাত ও প্রখ্যাত পরিবারের ইতিহাস তৈরি হওয়ায় লোকসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে পারিবারিক ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত তথ্য। এ ক্ষেত্রেও 'গতিধারা' সফলতার সাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, বাংলাদেশে, সত্যিকার অর্থে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে রয়েছে অপরিমেয় ঔদাসিন্য। আমাদের এই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের পৃথকভাবে প্রত্যেকটি জেলার ইতিহাস রচনায় আমাদের অবশ্যই নির্ভর করে থাকতে হয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিভিন্ন রচনার ওপর। এর কারণ এদেশে, অর্থাৎ বাংলাদেশে পর্যাপ্ত নথিপত্র, ঐতিহাসিক বিবরণ ও তথ্য তত্ত্বের মহাফেজখানা বা গ্রন্থাগার তৈরির সেরকম দৃষ্টান্তমূলক কোনো উদ্যোগ এখনো নেয়া হয়নি। যা আছে তা থেকে তথ্য ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য, অনেক ক্ষেত্রে সেখানে প্রবেশ করার পথ দর্গম।

পশ্চিমবঙ্গও বাংলা, আর বাংলাদেশও বাংলা এ দুই বাংলাকে পৃথক করে দেখার ধৃষ্টাতা কেবল রাজনৈতিক কারণে। সংস্কৃতিগত বৈশাদৃশ্যও ধর্মীয়, তবে উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য ভাষাগত এবং অনেকাংশে সংস্কৃতিগতও। সেই প্রাগৈতিহাসিক আমল থেকেই এ দুই বাংলার সংস্কৃতি ছিল একাত্ম। বর্তমান যে বিভাজন তা কেবল রাজনৈতিক কারণে। এর অন্যথা আমরা ভাবি না, ভাবতেও চাই না। এ বিভাজন মননে স্থায়ী রূপ পেলে তা কেবল আপন সহোদরাকেই অস্বীকার করা হবে।

আঞ্চলিক ইতিহাসে লোকসংস্কৃতির প্রভাব

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার অন্যতম শাখা হলো লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি হচ্ছে লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকবিশ্বাস, লোকাচার প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত ঐতিহ্যবাহী সমাজের সংস্কৃতি। এর মধ্য দিয়ে লোকজীবনের প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়, জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব হয় বিকশিত। প্রকৃতপক্ষে, নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষই এর স্রষ্টা ও লালনকর্তা। এ সৃষ্টি কখনো মুখে মুখে মৌখিক শিল্প বা সাহিত্যে কখনো শিল্পগুনান্বিত বস্তু আকারে, আবার কখনো শিল্পময় দৈহিক ভঙ্গিতে, কিংবা আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিতে রূপ লাভ করে।

একটি অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ও সমাজের গভীরতম স্তরে প্রবেশ করতে লোকসংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে লোকসংস্কৃতি নানাবিধ রূপ-রূপান্তর, গ্রহণ-বর্জনে নিজ অস্তিত্ব ও প্রবহমানতা ধরে রাখে। ফলে লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্যিক হয়েও প্রাণবন্ত, জীবন্ত ও চলমান। গ্রামের ও শহরের নিরক্ষর, অল্প বা অর্ধ শিক্ষিত বিশাল জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী আবহমান সংস্কৃতি হলো বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি। আর এর শিকড় আবহমানকালের বৃহত্তর এই জনজীবনের গভীরে প্রোথিত। এ শিকড়ের সন্ধান ও পরিমাপ করা যায় নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের পথ ধরে।

Khabor Dot Kom

ড. নীহার রঞ্জন রায় বলেন, 'আজও ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও সমাজশাস্ত্র পৃথিবীর জ্ঞানী ও পণ্ডিত সমাজে পৃথক পৃথক শাস্ত্র হিসেবেই স্বীকৃত; বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সেভাবেই হয়ে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে একটি জিনিস ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে, তা হচ্ছে এই যে, যত দিন যাচ্ছে তত যেন বিভিন্ন বিষয়ের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ঘুচে যাচ্ছে, একটি শাস্ত্রের সঙ্গে আর একটি শাস্ত্রের যোগাযোগ ঘনিষ্টতর হয়ে ধরা পড়ছে, বিশেষত জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে।' সুখের বিষয় ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান পরস্পর যত পৃথকই হোক, তার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আজ অস্বীকৃত নয়, কোনো পণ্ডিত সমাজে। সেদিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে, যখন এই তিনটি শাস্ত্রের ব্যবধান প্রায় একেবারে ঘুচে যাবে, এমন অনুমান খুব অযৌক্তিক নয়। আধুনিককালে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে নৃতত্ত্বের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে নৃতাত্ত্বিক উপাদানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় দৈহিক নৃতত্ত্ব ও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব। প্রথমটির ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের অন্যতম প্রধান উপায় দৈহিক সংগঠন ও রক্তের শ্রেণিবিভাগকরণ। দৈহিক সংগঠন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মস্তক, কপাল ও নাসিকার পরিমাপ এবং চোখ, চুল ও গায়ের রঙকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান, আঞ্চলিক ভাষা ও গ্রামীণ জীবনের খুঁটি-নাটি জ্ঞানের বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হলে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ক্ষেত্রে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক রহস্য উন্মোচিত হবে।

অপরদিকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা, আচার-আচরণ, ধর্ম, জীবনযাত্রা, অর্থনীতির বুনিয়াদ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবাহ, সামাজিক বিধি-নিষেধ ইত্যাদি অনুসন্ধান করতে সক্ষম হলে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। দৈহিক পরিমাপ দ্বারা একালের মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে অনুমানের কাছাকাছি পৌঁছতে সক্ষম হলেও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের আলোচনা ছাড়া নৃতাত্ত্বিক আলোচনার সামগ্রিক অনুশীলন সম্ভব নয়। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়– বাঙালি জনগোষ্ঠী একটি মিশ্র জাতি। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রণীত 'লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে— খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশে অস্ট্রিক, মোঙ্গলীয় ও নেগ্রিটো— এই কয়েকটি প্রধান রক্তধারার মানুষ বসবাস করত। আর্যরা এদের অনার্য বলে অভিহিত করে। এসব নরগোষ্ঠীর প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি রয়েছে; এরা কেউ কৃষিজীবী, কেউবা যাযাবর বা পশুপালনজীবী। ধর্মের দিক থেকে কেউ জড়বাদী, কেউ মূর্তিপূজক, কেউবা শক্তির উপাসক। কারো সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক, কারো মাতৃতান্ত্রিক। তেরো শতকের গোড়ায় মুসলিম আমল শুরু হয়। মুসলমানরা আরব, ইরান, তুর্কিস্থানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগমন করে। আরবের মুসলমানরা সেমেটিক রক্তধারার মানুষ। তারা ধর্মে একেশ্বরবাদী এবং মূর্তিপূজার বিরোধী। আঠারো শতকের মধ্যভাগে ইংরেজরা এদেশ দখল করে প্রায় দুশো বছর রাজত্ব করে। তারা নর্ডিক রক্তধারার মানুষ। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিতে এসব জনগোষ্ঠীর প্রভাব কোনো না কোনোভাবে চোখে পড়ে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দেশজ ও লোকজ সংস্কৃতিকে পুঁজি করে এবং বিদেশি সংস্কৃতির উপাদানগুলো আত্তীকরণ করে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে বিকশিত, পল্লবিত ও উদ্ভাসিত হয়েছে।

খ্রিস্টীয় পাঁচ শতকের পূর্বে এ দেশে আর্যদের প্রবেশ ঘটেনি। বুদ্ধি, মেধা-মননে আর্যরা ছিল তুলনামূলকভাবে অনার্যদের চেয়ে অনেক উন্নত। অনার্যরা স্বভাবতই ছিল ভীরু প্রকৃতির। স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে তারা ছিল সরল, শান্তিপ্রিয়, সংগ্রামবিমুখ, দায়িত্বহীন, দাস মনোভাবাপন্ন ও শিথিল যৌনাশক্ত। দ্রাবিড়রা ছিল কিছুটা সংযমী, সংগ্রামশীল ও আধ্যাত্মবাদী। অস্ট্রিকদের দেহবাদ ও দ্রাবিড়দের আধ্যাত্মবাদ পরবর্তীকালে তান্ত্রিকতা ও মরমিবাদের উৎস বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

বাংলার লোকসংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে আছে অস্ট্রিক সংস্কৃতি। অস্ট্রিক এই অনার্যদের জীবন ও জীবিকা ছিল মূলত কৃষি ও শিকারনির্ভর। অপরদিকে খ্রিষ্টপূর্ব দু-আড়াই হাজার বছর পূর্বে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে। তাদের অনবরত সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্যযুগে এদেশে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশে প্রায় সব রক্তধারার মানুষই বহিরাগত। প্রথমে এদেশে আসে নিগ্রোবটু, তারপর অস্ট্রিক, তারপর যথাক্রমে দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, আর্য, গ্রিক, শক, হুন, পাঠান, মুঘল, ইংরেজ প্রভৃতি। এরা প্রথমে

Khabor Dot Kom

Khabor Dot Kom

ভারতের উত্তর পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব গিরিপথ দিয়ে ভারত ভূমিতে এবং পরে বাংলার উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব নদী বেয়ে অথবা পাহাড়ি পথ ধরে বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। অনার্যরা আমাদের আদিবাসী বা আদিপুরুষ বলে বিবেচিত। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে এদেশের শূন্যভূমি দখলকারী এই অনার্যরা আদিতে ছিল বন্য ও বর্বর। ক্রমে তারা বিবর্তনে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

জনৈক লোকসংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ বলেন, 'গ্রহণ বর্জন দ্বারা যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, আদান-প্রদান দ্বারা চলমানতা, উদ্ভাবন ক্ষমতার দ্বারা নব সৃষ্টি ইত্যাদি না থাকলে সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তন ও প্রগতি সাধিত হয় না। এবং তা না হলে কোন জাতির পক্ষে সভ্য হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের আদিকালের প্রতিবেশী উপজাতির লোকেরা এসব সূত্র ধরে অগ্রসর হয়নি। কিন্তু আমাদের লোকসমাজ এদেরই জীবন, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতির পুঁজি নিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিল তা গ্রহণ-বর্জন, আদান-প্রদান, নতুন সৃষ্টি, পরিবর্তন ধারার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে আজকের বৃহত্তর লোকসমাজে উত্তীর্ণ হয়েছে। কালে কালে নতুন জাতি, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতির জোয়ার এসেছে, তাতে এ লোকসমাজ অবগাহন করেছে, নিজের মতন করে গ্রহণ করে পরিবর্তিত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে। এ মিলন ধারার আর্য, শক, হুন, পাঠান, মোগল, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের জীবনোপকরণ সঞ্চারিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির মূল উৎস ও ঐতিহ্য অনার্য জীবন ও তাদের জীবনযাত্রা প্রণালি। উপজাতির লোকেরা যেখান থেকে জীবনযাত্রা শুরু করেছিল প্রায় সেখানেই থেমে আছে, এজন্য তাদের সংস্কৃতিকে আদিম সংস্কৃতি এবং সজীব, সচল, গতিশীল লোকসমাজের রূপান্তরিত, পরিবর্ধিত ও পরিশীলিত সংস্কৃতিকে লোকসংস্কৃতি বলা হয়।'

উল্লিখিত লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞের প্রতিফলিত চিন্তার অলোকে আমরা বলতে পারি সেই ঐতিহাসিককাল থেকে বহিরাগত বিভিন্ন রক্তধারার জনগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণে বাংলার যে স্বকীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে তা একান্তই আপন। অঞ্চলভেদে ঘটেছে এর রূপান্তর, পরিবর্ধন কিংবা পরিবর্তন। সহজলভ্য উপকরণ, সবুজ প্রকৃতি, নরম পলিমাটি বাংলাদেশে আঞ্চলিক সংস্কৃতি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও সর্বাঞ্চলীয় ও সার্বজনীন লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্নতা। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাই সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সাংস্কৃতিক এলাকা চিহ্নিত করা যায় না। লোকসংস্কৃতি বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতি। এর শিকড় লোকজীবনের অন্তঃসলীলায় প্রবাহিত। লোকসংস্কৃতিকে তাই বলা হয় Pulse of the People. লোকসংস্কৃতির সাথে জাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। একটি জাতির ঐতিহ্যের শিকড় সন্ধান করতে হলে তাকে লোকসংস্কৃতির দ্বারেই যেতে হয়। হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত বাঙালির যে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, তা বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এতে অঞ্চলেগত সংস্কৃতির যে সামান্য ব্যত্যয় তার বৃহৎ সংজ্ঞায়ন করা যায় না, বরং ক্ষেত্রবিশেষে পরিপূরক ও স্বার্থাবদ্ধ রূপেই বিরাজমান। কারণ আর্য-অনার্যের সংস্কৃতির প্রভাব অঞ্চলভেদে অঙ্গীভূত হয়নি, সামগ্রিকভাবেই তা বিস্তার লাভ করেছে, পরিবর্তিত হয়েছে, পারিমার্জিত হয়েছে।

প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশের পূর্বে দুটি বিষয় সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা প্রদান আবশ্যক। তা হলো-আঞ্চলিক ইতিহাসের চৌহদ্দি বা বিষয় পরিধি এবং লোকসংস্কৃতির বিষয়-পরিধি-পরিসর কী? অর্থাৎ আঞ্চলিত ইতিহাসের বিষয়বস্তু ও লোকসংস্কৃতির বিষয়বস্তুসমূহ জানা গেলেই বেরিয়ে পড়বে লোকসংস্কৃতি কিভাবে আঞ্চলিক ইতিহাস-ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করে বা করতে পারে।

বাঙালির ও বাংলাদেশের ইতিহাস তথা বাংলাদেশের আঞ্চলিক ইতিহাসের মূখ্য বিষয়বস্তু হলো—বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ধারা-বৈশিষ্ট্য, বাঙালির ভাষাতত্ত্ব, বাঙালির আর্থ-সামাজিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তাদের দৈনন্দিন জীবনপ্রণালী, তাদের ভাষা-সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, তাদের শিল্পকলা, তাদের ধর্ম-কর্ম ধ্যানধারনা, তাদের চিন্তাচেতনা, মানসসংস্কৃতি ইত্যাদি। আর্থ-সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার মাটি ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস। দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস মানেই প্রতিটি জেলার মানুষের লোকসংস্কৃতির অঙ্গীভূত সকল বিষয়াবলি অনিবার্যভাবেই প্রভাব বিস্তার করে। কারণ এই জেলাগুলো প্রতিটি সাধারণ মানুষের বস্তুগত ও অবস্তুগত লোকসংস্কৃতির সামগ্রিকরূপই আঞ্চলিক ইতিহাস তথা গোটা বাঙালি জাতির ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়।

এবার আমরা দেখব লোকসংস্কৃতির বিষয়বস্তুগুলো কি কি এবং কিভাবে সেগুলো আঞ্চলিক ইতিহাসকে প্রভাবিত করে সেটি। লোকসংস্কৃতি মূলত লোকপুরাণ, লৌকিক দেবদেবী, লোকধর্ম, লোকপ্রথা ও ঐতিহ্য, লোকউৎসব, লোকশিক্ষা, লোকভাষা, লোকসাহিত্য, যথা-লোকসঙ্গীত, লোকছড়া,প্রবাদ, লোককাহিনী, কিংবদন্তি, লোকসংস্কার ও বিশ্বাস ইত্যাদি আলোচনা করে। এগুলোর মধ্যেই বাংলাদেশ তথা বাঙালির আঞ্চলিক ইতিহাসের অজস্র উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলো থেকে দুইভাবে ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমত, অতীতে শিক্ষিত জনগণ দ্বারা লোকসংস্কৃতির সংরক্ষিত উপাদান, যেমন- পুথি, লোকগান, লোকছড়া, লোকপ্রবাদ-প্রবচন, লোককাহিনী, কিংবদন্তি, লোকশিল্পের উপাদান, লোকধর্ম ও লৌকিক দেবদেবী বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত, যে সব ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির যাবতীয় উপাদান সংরক্ষিত হয়নি সেক্ষেত্রেও প্রচলিত বর্তমান লোকসংস্কৃতির বিষয়বস্তুগুলো পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আঞ্চলিক ইতিহাসে প্রামাণিক সত্য ও যৌক্তিক সম্ভাব্য সত্যের কাছাকাছি পৌঁছনো যায়।

এ পর্যন্ত আমরা বাঙালির যে ইতিহাস নির্মাণ করতে পেরেছি, অর্থাৎ কিছু বিষয়ে যে মোটা দাগে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি তা সম্ভব হয়েছে অনেকটা লোকসংস্কৃতির বর্তমান ও অতীত পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। যেমন উদাহরণ দিতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় একটি ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত যে, বাঙালি নৃতাত্ত্বিক বিচারে সঙ্কর জাতি। অর্থাৎ বাঙালির শোণিত ধারায় নানান জাতি, জাতিগোষ্ঠীর সম্মিলন-সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ইতিহাসবিদদের, ভাষাতাত্ত্বিকদের, নৃতাত্ত্বিকদের লোকসংস্কৃতির উপাদান বিশ্লেষণ সহযোগিতা করে। কিভাবে সেটা করতে পারে–তা যদি বুঝাতে চাই তাহলে বলতে হবে, বাঙালি একটি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভাষার বিচারে, মানে তাদের সকলের ভাষা বাংলা। এখন বাংলা ভাষায় সমগ্র বাংলাদেশে যারা কথা বলে তারা অসংখ্য জাতি, জাতিগোষ্ঠী, সামাজিক স্তরবিন্যাসে বিভক্ত। এদের এক এক অঞ্চলে লোকসংস্কৃতির যেমন ভিন্নতা রয়েছে, তেমনি বাংলা ভাষার উচ্চারণ ও ব্যবহারেও বিভিন্ন এলাকায় পার্থক্য রয়েছে। বাঙালির লোকগান, লোকনৃত্য, লোকযান, লোকধর্ম, লৌকিক দেবদেবী জাতি-জাতিতে, অঞ্চলে অঞ্চলে পার্থক্য রয়েছে। এসব সত্ত্বেও বাঙালি জাতির মূল সুর একটি জায়গায় সমন্বিত হয়েছে, সেটি হলো বাঙালি জাতির অঞ্চলে অঞ্চলে এত লোকসংস্কৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা বাংলায় কথা বলে। আর এটা সম্ভব হয়েছে হাজার বছরোর্ধ কালব্যাপী এই বাংলাভাষী জাতির পূর্বপুরুষের সম্মিলন ও নৃতাত্ত্বিক সংমিশ্রণে। অর্থাৎ বাঙালি জাতি বিভিন্ন জাতিতে জাতিতে, অঞ্চলে অঞ্চলে লোকসংস্কৃতির ভিন্নতাই বলে দেয় বাঙালি একটি সঙ্কর জাতি।

প্রাচীন বাংলার এমনকি মধ্যযুগের, আধুনিক যুগের বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারক-বাহক হলো গ্রামবাংলার অধিবাসীগণ। এরা সাধারণ বাসিন্দা, কৃষক, কারিগর শ্রেণি, বারুজীবী, ভূমিহীন কৃষক, তাঁতি, কুমার, কামার, জেলে, সূতার, মালি, চিত্রকর, তৈলকার প্রভৃতি। এছাড়াও গ্রামে বাস করে ছোট ছোট ব্যবসায়ী শ্রেণি যেমন, তেলবিক্রেতা, মিঠাই বিক্রেতা, দোকানদার, সমাজ সেবকেরা যেমন, রাখাল, নাপিত, ধোপা, নর্তক ইত্যাদি। এছাড়া অসংখ্য বর্ণভিত্তিক জাতি, অন্ত্যজ জাতি, জাতিগোষ্ঠী যেমন, চামার, মুচি, কসাই, সাপুড়ে, কোল-ভিল, শবর, হাড়ি, ডোম বিভিন্ন আদিবাসীগণ। এরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই ব্যাপকভাবে বসবাস করে। আঞ্চলিক ইতিহাস তথা বাঙালির ইতিহাস এই শ্রেণির প্রায় ৯০% মানুষকে বাদ দিয়ে বা তাদের সমাজ-সংস্কৃতি বাদ দিয়ে হতে পারে না। তাই তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন ও ইতিহাস মানেই তাদের লোকসংস্কৃতির ইতিহাস। তাদের লোকসংস্কৃতি ব্যাপকভাবে ইতিহাসকে প্রভাবিত করে। ইতিহাস শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, লিপিসাহিত্য, সরকারি রাজকীয় দলিল দস্তাবেজের প্রামাণিক উপকরণের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখলে সেই ইতিহাস কখনো গোটা জাতির আর্থ-সামাজিক ইতিহাস সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই ইতিহাসের এক বিশাল উপাদানের যোগানদাতা এদেশের লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির মাধ্যমেই জানা যায় প্রাচীন বাংলার মানুষের নিত্য ব্যবহার্য উপাদান কি ছিল, সে সময় তাদের খাদ্য-খাবার কি ছিল। প্রাচীন পোড়ামাটির ফলকে, মন্দির গাত্রে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকশিল্পীকৃত মৃৎশিল্প ও লোকজ শিল্পগুলো আলোচনা করলে ইতিহাসের যে বিশাল তথ্যের আকর পাওয়া যায় তা ইতিহাসকে ব্যাপকভাবেই প্রভাবিত করে এসেছে। যেমন, লোকজ শিল্পকর্মে, পোড়ামাটির ফলকে প্রাচীনকালের বাংলার আম, কাঁঠাল, আখ, কলা, তাল, ডালিম, খেজুর প্রভৃতি ফল যে খেত তার পরিচয় মেলে। পোড়ামাটির ফলকে ও মন্দির গাত্রের লোকসংস্কৃতির অঙ্গীভূত নক্‌শা, প্রাচীনকালের ও মধ্যযুগের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে ফুটে উঠেছে অন্যান্য ঐতিহাসিক উপাদানে তা এতটা ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় না। ছড়া, প্রবাদ প্রবচনের মধ্যেও ইতিহাসের উপাদান

Khabor Dot Kom

লুকিয়ে থাকে। লোককথা, রূপকথার মধ্যেও পাওয়া যায় ইতিহাসের কোনো ঘটনার সাক্ষ্য। ইতিহাসে নির্মাণে ঐতিহাসিকগণ তাদের বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষমতা প্রয়োগ করে এগুলো ব্যবহার করে থাকেন। তাই আঞ্চলিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য ব্যাপকভাবে লোককলা দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন ছড়ার মাঝে ইতিহাসের উপাদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বলা যায় :

"খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।"

এ দেশে এক সময় বর্গিদের অত্যাচার ও লুণ্ঠন দ্বারা শঙ্কিত ছিল জনসাধারণ। এক সময় বর্গিরা জনগণের কাছ থেকে জোর করে খাজনা আদায় করতো তা বিধৃত হয়েছে ছড়ার মধ্যে। এভাবে লোকগান, লোকধর্মে, লৌকিক দেবদেবীর মাঝে, লোকযান, লোকপ্রযুক্তি, বাংলার স্থাননামের মাঝে অজস্র ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। সে কারণেই আঞ্চলিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ঐগুলোর সবল-সফল ব্যবহারের ফলে আমাদের আঞ্চলিক ইতিহাস তথা বাংলাদেশ ও জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং আরো এগুলোর উপাদান ব্যবহার আমাদের আঞ্চলিক তথা জাতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধশালী করবে।

আমার এই প্রবন্ধটি আপনারা অসীম ধৈর্য্যসহ শুনেছেন। তার জন্য আপনাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এই প্রবন্ধের উপর আলোচকদের যেসব মূল্যবান মতামত উপস্থাপিত হবে তার আলোকে এই প্রবন্ধের কোনো গ্রহণ-বর্জন, সংযোজন-বিয়োজন প্রয়োজন যদি পড়ে তা অবশ্যই করা হবে। সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা।

Khabor Dot Kom

সিকদার আবুল বাশার, আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক, প্রচ্ছদশিল্পী ও প্রকাশক